



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1156 - 1166

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

আধুনিকতার প্রতিভূ, বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রাবন্ধিক রাজা রামমোহন রায়

সুপ্রীতি হাজরা

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: supritihazra93@gmail.com

ID 0009-0007-1919-2945

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Raja Rammohan Roy, Unish Shatak, Bengali Essay, Sati-Daho pratha, Sati, Bharatpathik, Nineteenth Century, Social Reformer Rammohan, Renaissance of Bengal.

Abstract

The nineteenth century was the age of the Renaissance in Bengal. Not only Raja Rammohan Roy was the pioneer of the Bengal Renaissance, has he been dubbed the 'Father of Indian Renaissance'. He was given the title of Raja by Mughal emperor Akbar II. He was a social reformer and a writer, who fiercely campaigned against the practice of Sati (widow immolation), mobilizing public opinion and persuading British Governor-General Lord William Bentinck to enact the Bengal Sati Regulation in 1829, making it illegal and punishable by law. At that time, there was no ideal written form for writing in prose in Bengali. In this article, I have tried to establish his name as the pioneer in writing a successful objective essay in the Bengali language. From his two essays on 'Sati-daho pratha' named "Sahamaran Bishayak Prabartak o Nibartak er Sambad" 1st and 2nd Prastab, I have found all the characteristics of an objective essay, successfully built by Rammohan Roy, in the early stage of modern Bengali literature. This article has discussed also about Raja Rammohan Roy's growing up, education, social activities and how he made his writing as a weapon to fight against the superstitions. Mainly this article is establishing his essays on Sahamaran, as the first proper essay writing in Bengali.

Discussion

এককথায় আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে স্মরণীয়, বহু চর্চিত মহাপুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। যাঁর ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের চিত্ত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অল্প জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।”

যাঁর ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং চিন্তা-মনন ও কর্মভাবনার প্রবাহ আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে আজও।

উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ বারে বারে মুগ্ধতায় নানা অভিধায় আখ্যায়িত করে যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

“বর্তমান বাংলাদেশের নির্মাণকর্তা”, ‘পথপ্রদর্শক’, ‘মধ্যযুগের ভারতবর্ষের কবীর, দাদুর মতো ভারতপথিক, যাঁরা মুক্ত প্রাণের বার্তা এনে মিলনের পথ দেখিয়েছিলেন, আধুনিক যুগে সেই পথের পথিক রামমোহন রায়।”^২

যিনি “বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া তুলিয়াছিলেন”,^৩ সেই ‘অগ্রণী মহাপুরুষ’, ‘মুক্তিদূত’ — এতগুলো অভিধা! এবং আরও আছে। পেশাসূত্রে তখনকার ভারতীয়দের মধ্যে সরকারের কাছে সর্বোচ্চ পদে থাকা দেওয়ান বা সেরেসজাদার রামমোহন রায় ‘দেওয়ানজী’ বলে পরিচিত। উনিশ শতকের নবচেতনার অগ্রদূত, ‘আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক’^৪ বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে, যাঁর কর্মধারা বহুবিস্তৃত ও বহুমুখী; প্রমথ চৌধুরী বলছেন, -

“যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তা এই যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধান লেখক।”^৫

এহেন ব্যক্তিত্ব সমাজ সংস্কারের তাগিদে যখন আন্দোলনে নামেন আর অস্ত্র হিসাবে লেখনী ধারণ করেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি করে।

রামমোহন রায়ের প্রথম দিকের দুটি মৌলিক রচনা ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ প্রথম প্রস্তাব (১৮১৮) এবং একই নামে দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮১৯) নিয়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে সে যুগের এই প্রখর যুক্তিবাদী ও সবদিক থেকে আধুনিক মননের অধিকারী লেখক রামমোহনের কলমে নির্মিত সাহিত্য-সংরূপ সম্বন্ধে একটি দিক আলোচনার আলোকে আনার প্রয়াসমাত্র বর্তমান বক্তব্য বিষয়।

(১)

‘রামমোহন রায়’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী ঘোষণা করেন—

“জ্ঞান কর্মের সমন্বয় করবার জন্য ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ ছিল যে, কর্মহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন কর্ম অন্ধ। রামমোহন রায় এঁদেরই বংশধর, এঁদেরই পাঁচজনের একজন।”^৬

অন্যদিকে, সমাজ ও সময়, বাংলা ও বাঙালির প্রতি তাঁর অবদান বিষয়ে প্রথমেই যে প্রসঙ্গটি সকলের স্মরণে আসে তা হল— আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত অমানবিক, নিষ্ঠুর ‘সতীদাহ প্রথা’ বন্ধ করতে তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। সক্রিয় তৎপরতায় ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যার ফলস্বরূপ লর্ড বেন্টিন্কে কর্তৃক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উপযোগী ভাষা ও নির্মাণশৈলীর প্রথম ব্যবহারই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। সেখানে আপাত ভাবে সতীদাহ প্রথা নিবারণের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার চর্চিতচর্চণ করা উদ্দেশ্য নয়। তবে, মানুষ এবং তার সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য এরা সময়ের স্রোতে ভাসমান পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। যেকোনো ঘটনার থাকে কার্যকারণগত প্রেক্ষাপট, যেমন text এর context। প্রসঙ্গত রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক রচনাদুটির প্রেরণামুখটি ঐতিহাসিক, তাই উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রেক্ষাপট, সেই যুগ ও সমাজ, সর্বোপরি রামমোহনের ব্যক্তিমানসকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রসঙ্গত বীরবলের একটি উক্তি স্মরণে আসে—

“কারো ছবি আঁকতে বসে তার মাথা বাদ দিয়ে দেহটি আঁকলে সে চিত্র পূর্ণাঙ্গ হয় না।”^৭

উনিশ শতকের বাংলা এসেছিল ‘নবজিজ্ঞাসার যুগ’ নিয়ে। স্বপন বসুর কথায় -

“এই জিজ্ঞাসা বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা— এবং তা প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিকে অবলম্বন করে।”^৮

কলকাতা হয়ে উঠছিল এই নবজিজ্ঞাসার পাঠস্থান এবং এর সূত্রপাত হয় সেকালের কলকাতার বিত্তশালী, ক্ষমতাবান প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব, দেওয়ান বা জমিদারদের হাত ধরে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে সকল ভিন্ন মতবাদ, আন্দোলন তৈরি হয় ধর্মীয় ভাবনা ও আচার ব্যবস্থাকে ঘিরে, তার মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথাটি হল ‘সতীপ্রথা’। দীর্ঘকাল থেকে স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর চিতায় সশরীরে জীবিত স্ত্রীর সহমরণের প্রথা চলে আসছিল। ‘সতীপ্রথা’ নামে যার মাহাত্ম্য

প্রচার করা হত। ‘সতী’ হবে যে নারী, সে যে কত কল্যাণী তার বংশের জন্য, মৃত্যুর পর স্বামীর সঙ্গে অক্ষয় সুখ ভোগ করবে স্বর্গে গিয়ে— এ সকল অলীক স্বপ্ন একটা নারীর মনে ও মননে ছোটো থেকেই বুনে দিত সেই সমাজ। যার ফলে বৈধব্যের যন্ত্রণার পথে না গিয়ে দৈবী মাহাত্ম্যের আকর্ষণে দলে দলে নারীদের ‘সতী’ হওয়ার অজস্র ঘটনা ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল তথা সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে। ‘সতী’ হওয়ার ইচ্ছে নাকি বলপূর্বক ‘সতী’ করার প্রচেষ্টা— সমাজমানসে কোনটি প্রবল ছিল? তা নিয়ে মতবিরোধ প্রচ্ছন্নভাবে তো ছিলই, তবে এ প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দিল উনিশ শতকীয় নবচেতনার আলোকে, যুক্তিবাদী শিক্ষিত আধুনিক মনে। প্রশ্ন উঠল এই নিষ্ঠুর প্রথার যৌক্তিকতা নিয়ে। মধ্যযুগ থেকেই এদেশে এই প্রথার অতি প্রচলনের সাক্ষ্য মেলে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদেরকে বংশের মানরক্ষা, পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে রাতারাতি দেবী মাহাত্ম্য লাভের লোভ, বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে অনন্ত সুখভোগ এবং স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধারের বাসনায় এই যে ‘সতী’ হতে হত — আসলে সমাজ সেখানে পেত বিধবার জীবনের বোঝা বহনের থেকে অব্যাহতি; কেউ কেউ ‘সতী’ হতে না চাইলে সেই বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করতে এবং ব্রাহ্মণদের আর্থিক উপার্জনের স্বার্থে বিধবাদের চরিত্রস্বলনের অপবাদ দিয়ে জোর করে ‘সতী’ হতে বাধ্য করা হত।

সালটা ১৭৭২খ্রিঃ মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ, সবে ইংরেজ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবাবী আমলের শিক্ষা ও চিন্তাধারা তখনও অব্যাহত। তৎকালীন বর্ধমান, বর্তমান হুগলীর রাধানগরে বিত্তশালী ব্রাহ্মণ রামকান্ত রায়ের দ্বিতীয় পত্নী তারিণী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান (ছোটো পুত্র সন্তান) রূপে রামমোহনের জন্ম হলো। নবাবের কাছ থেকে ‘রায় রায়ান’ উপাধি লাভ করেছিলেন রামমোহনের প্রপিতামহ। সেই থেকে তাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায় পদবী ছেড়ে ‘রায়’ উপাধিই ব্যবহার করতেন।

ছোটবেলায় গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বাংলা শেখা, অন্যদিকে মৌলভির কাছে তাঁর ফারসি শেখা শুরু হল। এরপর আরবি শিখতে পাটনা গমন। সুফি গ্রন্থ ও দর্শনের সাথে পরিচয়, সেই সঙ্গে কোরান ও ইসলামি বহু গ্রন্থপাঠ। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু সমাজের মূর্তি পূজার অযৌক্তিকতা, আচার সর্বস্বতা, জাতিভেদের সংকীর্ণতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন জাগে, সেই সঙ্গে রামমোহনের মন একেশ্বর ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, সংস্কৃত অধ্যাপক নবকুমার বিদ্যালংকার তথা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ধর্মমত নিয়ে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে গৃহত্যাগ করেন। কথিত কাহিনি অনুসারে এরপর বাড়ি থেকে পালিয়ে তাঁর তিব্বত গমন, বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সেখানেও লামার সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয় লামাকে জীবন্ত দেবতারূপে অস্বীকার করায়। অতঃপর নাকি তিব্বতি রমণীদের সহায়তায় জীবন সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। বাড়ি ফিরে পুনরায় বেনারস গমন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। এসময়েই ইংরেজি শিক্ষারও শুরু। ১৭৯৬ সালে পিতা রামকান্ত রায়ের করা দানপত্রের মাধ্যমে পৈতৃক সূত্রে জোড়াসাঁকোর বাড়িটি পান। ১৭৯৯ সালে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর নামে দুটি বড়ো তালুক ক্রয় করেন। অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ১৮০০ সাল থেকেই বাংলার বাইরে পশ্চিমে সময় কাটাচ্ছেন। মতান্তরের জেরে পিতা ও দাদার সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, এমনকি পিতার শ্রাদ্ধও করলেন কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে। ১৮০৫ সালে ডিগবির অধীনে কোম্পানি সরকারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮১৪ পর্যন্ত জন ডিগবির খাস মুন্সি হিসাবে ছিলেন। ১৮১৫ সাল থেকে স্থায়ীভাবে তিনি কলকাতা নিবাসী হন। কলকাতায় আসা থেকেই রামমোহন তাঁর নিজস্ব চিন্তা, ধর্মীয় মতামত প্রকাশ ও প্রচারের উপর গুরুত্ব অনুভব করেন। রামমোহন উপলব্ধি করেন ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং এই কথাই প্রাচীন শাস্ত্র বেদ ও উপনিষদের মূল কথা। নিজ চিন্তাচেতনার প্রসার ও মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য এসময় থেকেই রামমোহন তাঁর কর্মোদ্যমের চালনা করতেন এবং নিজ মতামত প্রকাশের অবলম্বন হিসাবেই তাঁর লেখনী ধারণ। একাধারে নানা ভাষায় দক্ষতা, শিক্ষা, অর্থ, সম্মান, কর্ম, চিন্তা, বুদ্ধি, স্বভাব, চরিত্র, সাহস নিয়ে ব্যক্তি রামমোহন তাঁর সময়ের থেকে ছিলেন অনেক এগিয়ে।

এহেন রামমোহন চোখের সামনে নিজের বৌদিকে ‘সতী’ হতে দেখলেন কিন্তু, বিরোধিতা করেও আটকাতে পারলেন না। চতুর্দিকে অজস্র মেয়েদের ‘সতী’ হওয়ার ঘটনা শুনছেন। ঘটনাস্থলে গিয়েও অনেকক্ষেত্রেই এই নির্মম প্রথার হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাতে পারছেন না। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে কিংবা, যাতে পালাতে না পারে তাই চিতার সঙ্গে বেঁধে, বাঁশের সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে পোড়ানো হচ্ছে। সঙ্গে আর্তের ক্রন্দন, চিৎকারকে ঢাকা

দিতে এবং একই সঙ্গে ছদ্ম দৈবীমাহাত্ম্য তৈরি করতে খোল-করতালসহ বাজনা এবং মানুষের সতী সতী বলে উচ্ছ্বাস-কলরবের অভাব ছিল না। তবে, অনেকক্ষেত্রেই 'সতী' মাহাত্ম্যের আবেশে অচল নিষ্ঠার সঙ্গে অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত মেয়েদের স্বেচ্ছায় চিতা আরোহনের অজস্র ঘটনাও দেখা গেছে।

এমন একটি নির্মম প্রথা যা মানবিকতার ও যুক্তি-চিন্তা-শিক্ষার বিপরীতে হাঁটে, তা কোনো শিক্ষিত সভ্য সমাজের সংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারে না— জোরালো ভাবে তাই 'সতী' প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পথে নামলেন রামমোহন। সংকল্প করলেন এ প্রথার উচ্ছেদ করবেন। সেক্ষেত্রে চাই লোকবল, সমাজ সচেতনতা। একদিকে তাই, কোথাও 'সতী' হচ্ছে শুনলেই যেমন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মানুষজনকে বুঝিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছেন ওই নির্মম হত্যাকাণ্ড। একই সঙ্গে, সমাজের শিক্ষিত মানুষ, অন্ততপক্ষে যারা শিক্ষার আলোয় এসে কুসংস্কার মুক্ত হয়েছে, পড়তে জানে এমনটা আশা করা যায়, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে লেখনী ধারণ করছেন। দেশবাসী তথা শিক্ষিত বাঙালির চোখে বিষয়টির যৌক্তিকতা নিয়ে মাতৃভাষা বাংলায় এবং একইসঙ্গে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের মনোযোগ টানতে ইংরেজিতেও লিখছেন। ১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (প্রথম প্রস্তাব) প্রকাশ করলেন বাংলা গদ্যভাষায় এবং এর ইংরেজি অনুবাদ 'Translation of a conference between an Advocate and an Opponent of the practice of Burning Widows Alive' প্রকাশিত হল একই সঙ্গে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে। রামমোহন রায়ের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ১৮১৯ -এ কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করেন।^৯ এসকল বিদ্রূপ-বিরোধিতার প্রত্যুত্তরে রামমোহন লিখলেন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৯) দ্বিতীয় প্রস্তাব, মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। এখানে উল্লেখ্য, প্রথমদিকে ইংরেজ মিশনারিগন সতীদাহপ্রথা নিয়ে নিন্দা করলেও, কোম্পানির শাসকগণ এ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চায়নি শাসনক্ষমতা রক্ষার স্বার্থে। কারণ 'সতীপ্রথা' তখন এদেশে প্রচলিত দীর্ঘকালের ধর্মীয় সামাজিক ঐতিহ্য। ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানলে বিক্ষোভ ও বিরোধিতার প্রবল সম্ভাবনা, তাই কোম্পানি সরকার এ বিষয়ে নীরব ছিল। এদেশীয় তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণি, সমাজের উচ্চপদস্থ মানুষের মধ্যেও এই প্রথার প্রতি সমর্থন ছিল এবং একইসঙ্গে নারীজাতির প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা, মানবিক চেতনার অভাব দেখেছিলেন তারা। রামমোহনই প্রথম এবিষয়ে এগিয়ে এলেন। তাছাড়া রামমোহন ভিন্ন অন্য কারো মধ্যে তখন হয়তো এমন প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের বিরল মিশ্রণ ছিল না। নেতৃত্বদানের দক্ষতা ও ক্ষমতারও অভাব ছিল। যুক্তিবাদী ভাবনার আলোকে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে লেখায় তুলে ধরলেন। প্রচলিত প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে যে অসমর্থন আছে, কঠোর কোনো নির্দেশ নেই, বরং ব্রহ্মচর্য পালনের কথা উল্লিখিত হয়েছে বিধবাদের জন্য, প্রচলিত প্রথার অযৌক্তিকতার সব দিকগুলি স্পষ্ট করে দেখালেন সর্বজন সমক্ষে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা চিন্তাশীল মানুষের মুখপত্র হিসাবে রামমোহনের প্রশংসায় মুখরিত হলো। তবে, রাতারাতি কোনো সার্বিক সমর্থন বা সফলতা পাননি রামমোহন। তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বহু বিরোধিতা, বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত আক্রমণের। দমে যাননি, আর এখানেই রামমোহনের অসীম সাহসিকতা ও অসাধারণত্ব। অবশেষে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ গভর্নর হয়ে আসার পর বিষয়টি তাঁর নজরে এলে, তৎপরতার সাথে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে 'সতীপ্রথা' বন্ধ করার নির্দেশ জারি হয়ে গেল দেশে।

(২)

অন্যদিকে, সেসময়ের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখব, প্রথমদিকে পোর্চুগিজ মিশনারিদের প্রচেষ্টায় এবং পরে উনিশ শতকের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্যে পুস্তিকা রচনা ও ছাপার সূত্রপাত হয়েছিল। মূলত তা বিদেশি মিশনারিদের হাত ধরে একদিকে, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে এদেশের ভাষা শিখে এদেশের সমাজ, মানুষের সঙ্গে পরিচিত ও সংজ্ঞাপনের (Communication) উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসকল উদ্যোগে কোথাও বাংলা ও বাঙালির শিক্ষা ও হিতের কথা ভাবা হয়নি। এই উদ্যোগের পিছনে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার সহায়তার উদ্দেশ্য ও নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়নদের বাংলা ভাষা শিক্ষা ব্যতীত অন্য ভাবনা ছিল না।

বাংলা গদ্যে, এদেশের মানুষের জন্য তাদের ভাষায় কিছু লেখার কাজটাই প্রথম হয়েছিল রামমোহনের হাতে। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি নিজ উদ্যোগে নিজস্ব মতাদর্শ নিয়ে বাংলা গদ্য ভাষায় পুস্তিকা লিখছেন। প্রথম দিকে ‘বেদান্তগ্রন্থ’ ও ‘বেদান্তসার’ (১৮১৫) নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যা মূলত উপনিষদের অনুবাদ মূলক রচনা। উক্ত পুস্তিকা দুটিতে প্রকাশিত রামমোহনের ধর্মভাবনার বিরোধিতা শুরু হলে অতঃপর তার প্রত্যুত্তের ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ (১৮১৭), ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’ (১৮১৮) নামে বিতর্ক মূলক রচনা দুটি প্রকাশিত হয়। এরপর, ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ প্রথম প্রস্তাব ও দ্বিতীয় প্রস্তাব শীর্ষক নামে লেখা দুটিতেই প্রথম তিনি মৌলিক ভাবে বিশেষ একটি সমাজ প্রচলিত প্রথা নিয়ে, নিজস্ব ভাবনা ও বক্তব্যকে যুক্তিবাদী ভঙ্গিতে চিন্তাশীল প্রবন্ধের আকারে তুলে ধরেছেন। এরপরও রামমোহনের সম্পাদনায় বাংলা, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত তিনটি পত্রিকা, বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। তবে, আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সহমরণ বিষয়ক লেখা দুটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে কতদূর সার্থক তাই বিবেচ্য।

(৩)

ভাষাবিজ্ঞানী বলেন, -

“ভাষা শুধু বার্তা বিনিময়ের বাহন নয়, ভাষা উদ্বোধন এবং উদ্দীপনেরও সহায়ক।”^{১০}

অর্থাৎ ভাষা, -

“একটি অস্ত্রও বটে, সংগ্রামের অস্ত্র, সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়ার অস্ত্র।”^{১১}

ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার কর্তৃক ভাষার গুরুত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ে উক্ত মন্তব্যকে সামনে রেখেই আমরা রামমোহন রায়ের ‘সহমরণ বিষয়ক’ লেখা দুটির ভাষা-শৈলী-সাহিত্য-সাহিত্য সংরূপগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। রামমোহনও এক্ষেত্রে সমাজের জনসাধারণের চেতনা জাগাতেই লেখনী ধারণ করেছিলেন, আর আশ্রয় করেছিলেন মাতৃভাষা বাংলাকেই। অবশ্য একই সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির শাসকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সেই বক্তব্যকে ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা গদ্যভাষায় লিখিত সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব দুটিতে ভাষানির্মিত ও ভাষারীতির দিকটি লক্ষ করা যাক—

(১) বাঙালি জনমানসের উদ্দেশ্যে রামমোহন যখন বাংলা গদ্যে লিখছেন তখন মৌলিক রচনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মান্য গদ্যভাষারীতি বাংলায় গড়ে ওঠেনি। ইতিপূর্বে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক রচনার স্বার্থে সাধু-চলিতভাষা নির্মাণে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ‘বাংলা শিশু গদ্যভাষা’ নির্মাণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কারের নাম উল্লেখ্য। কিন্তু, সর্বজন সমক্ষে বাংলা গদ্যে নিজের কথানির্মাণ, মননশীল মৌলিক রচনা তথা সাহিত্য নির্মাণে বাঙালি অভ্যস্ত নয় তখনও, আদর্শ ফর্মের অভাবে। রামমোহনকে সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী বাংলা গদ্য ভাষা, নিজের ভাষার ছাঁদ গড়ে নিতে হচ্ছে। বলা যায় ভাষা-পরিকল্পনা করে তার প্রয়োগ করছেন।

(২) ভাষার লেখ্যরূপ দিতে তিনি সাধু ভাষারীতিই ব্যবহার করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘সাধুভাষা’ কথাটি রামমোহনই প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর ‘বেদান্তগ্রন্থে’ (১৮১৫)। ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ শীর্ষক প্রস্তাব দুটিতে সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে —

- তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যথা- চতুর্দশ, অগ্নি, স্ত্রী, বক্ষ, স্মৃতি, বচন, আচার্য ইত্যাদি অজস্র সংস্কৃত তৎসম শব্দ চোখে পড়বে।
- ভাষায় সমাসবদ্ধ পদের প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। যথা- আচমনপূর্বক, পূর্বোক্ত, আত্মঘাতজন্য, স্মৃতিবচন ইত্যাদি।
- সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়েছে, যথা- “নিবর্তকের উত্তর। সর্বশাস্ত্রেতে এবং সর্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।”^{১২} ‘তাঁহারাই’, ‘যাঁহাদের’ সর্বনামগুলির ব্যবহার লক্ষণীয়।

- ক্রিয়ার দীর্ঘরূপের ব্যবহার চোখে পড়ে। যথা— “যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও শুন।”^{১৩} এছাড়াও ‘লিখিতেছেন’, ‘করিয়াছেন’, ‘করিবেন’, ‘থাকিবেন’ ইত্যাদি।
- যৌগিক ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যথা— ‘করিতে চাহ’, ‘থাকিয়া-করিবেন’, ‘করিয়া থাকিবেন/ থাকেন’ ইত্যাদি।
- অনুসর্গের সাধুরূপের ব্যবহার দেখা যায়। যথা— ‘দ্বারা’, ‘সহিত’, ‘ন্যায়’ ইত্যাদি।
- সাধুভাষার কর্ম-কর্তা-ক্রিয়ার বিন্যাসক্রম বাক্যে লঙ্ঘিত হয়নি। যথা— “তুমি যাহা কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।”^{১৪}

(৩) বাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে ইংরেজি Complex Sentence –এর অনুসরণে ভাষায় জটিল বাক্যেরই বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন, সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব থেকে থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করলে দেখি –

“স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জলন্ত চিতাতে আরোহন করে সে অরুক্ষতী যে বশিষ্টের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। ...যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।”^{১৫} [প্রবর্তকের সংলাপ]

কিন্তু, -

“নিবর্তক। এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ হয় কিন্তু বিধবাবধর্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।”^{১৬}

উদাহরণ দুটি থেকে যৌগিক ও সরল বাক্যের মিশ্রণে দীর্ঘ মিশ্র জটিল বাক্যের ব্যবহার এবং ইংরেজি বাকবিন্যাসের রীতির যে আদর্শ জটিল বাক্যের গঠনে তার অনুসরণের প্রয়াস চোখে পড়ে।

(৪) মনুস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি, বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি থেকে বহু সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করেছেন এই প্রস্তাবে। তবে, যুক্তি ও প্রামাণ্য তথ্যের নিদর্শন উপস্থাপনের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল ওই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করার।

(৫) “রামমোহনের হাতেই বাংলা গদ্যভাষা প্রথম আভিজাত্য লাভ করল।... প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমানে এবং যুক্তির প্রবলতায়, তীক্ষ্ণ বিতর্কে তাঁর গদ্য এক কাঠিন্য পৌরুষ লাভ করল।... রামমোহনের গদ্য সরল ছিল না এজন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা চলে না। পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি ‘ভাষাকে জড়ত্ব ও অকারণ কাঠিন্য থেকে মুক্ত করেছিলেন’, ভাষার পৌরুষ ও যুক্তিপ্রাণতার সাথে ‘পদবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি বাংলা ভাষার স্বরূপ ধর্মকে অনেকখানি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।”^{১৭}
— ‘বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস’ গ্রন্থে ক্ষেত্র গুপ্ত এমন মতামত রেখেছেন। আবার ঈশ্বর গুপ্ত তো বলেছিলেন—

“দেওয়ানজী জলের মতো বাঙ্গালা লিখিতেন।”^{১৮}

উপরিউক্ত মন্তব্য সাপেক্ষে প্রথম প্রস্তাবের কয়েকটি লাইনের উদাহরণ নিম্নরূপ —

“নিবর্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায়া ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত করান অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে ঐ সকল বচনানুসারে তোমাদের রচিত সংকল্পবাক্যতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওনকালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখ। এসকল বন্ধনাদি কর্ম হারীতাদি বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।”^{১৯}

দেখা যাচ্ছে রামমোহনের গদ্য পাঠ করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে না, সেইসঙ্গে অর্থ ও ভাব অনুসারে উপযুক্ত বিরতি নিয়ে পড়লে বক্তব্যবিষয় বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। ভাষা সহজবোধ্য এবং বাংলা ভাষার পদবিন্যাস রীতিও স্পষ্টত লেখকের

অনেকটা আয়ত্তে। (৬) পূর্ণচ্ছেদ (।), কমা (,), সেমিকোলন (;) ইত্যাদি অর্থযতির ব্যবহার নেই, কারণ গদ্যভাষার লেখ্যরূপে ব্যবহৃত বাক্যে ছেদ-যতির ব্যবহার তখনও প্রচলিত হয়নি।

চমস্কি বলেছিলেন, ভাষিক দক্ষতা (Competence) এবং ভাষিক প্রয়োগের (linguistic performance) কথা (১৯৬৫, Aspect of the Theory of Syntax)। যেখানে ভাষিক দক্ষতা হল বক্তা-শ্রোতার ভাষার সাংগঠনিক নিয়ম সম্পর্কে সহজাত জ্ঞান। ভাষিক প্রয়োগ বলতে তিনি বলেছেন, অবস্থানভেদে ভাষার যথাযোগ্য ব্যবহার। অন্যদিকে, নৃতাত্ত্বিক ডেল হাইমস বললেন, দক্ষতা থাকলেই হবে না, উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কখন, কার প্রতি, কীভাবে ভাষা ব্যবহার করবে বক্তার সে বিষয়ে থাকতে হবে যথার্থ জ্ঞান। আর এই 'জ্ঞান সে অর্জন করে ভাষার সামাজিক সাংস্কৃতিক নিয়ম জেনে', হাইমসের মতে, 'ভাষা নয় সংজ্ঞাপনই (Communication) হল মূল বিষয়' -

“It is rather that it is not linguistics, but ethnography, not language, but communication, which must provide its frame of reference within which the place of language in culture and society is to be assessed.”^{২০}

সেদিক থেকে বাংলা লিখিত গদ্যভাষা নির্মাণের সূচনাপর্বে, সাহিত্য রচনার উপযোগী ভাষারীতি নির্মাণ, উপস্থাপন রীতির পরিকল্পনা, চিন্তাশীল প্রবন্ধের আকারে নিজ বক্তব্যকে বাঙালি সমাজের কাছে যেভাবে তুলে ধরেছেন রামমোহন তাঁর 'সহমরণ বিষয়ক' প্রস্তাবে— ভাষানির্মিত এবং ব্যবহৃত ভাষারীতিগত দিকের সার্থকতা নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন আর থাকে না।

(৪)

'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' - এর রচনামূল্যের অন্যান্যদিক আলোচনা করতে গেলে শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শৈলীবিজ্ঞানীরা সাহিত্যবিচারের যে সকল মাত্রা নির্ধারণ করেছেন সেই বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সেদিক থেকে সাহিত্য সংরূপ হিসাবে আলোচ্য বিষয়ের বিচারে দেখি—

- সহমরণ বিষয়ক লেখায়, লেখক রামমোহনের ছিল— যুক্তিবাদী মন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সেইসঙ্গে তিনি সমাজ সচেতন, আধুনিক ও মানবদরদী। ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে এবং সর্বজনবোধ্য বাংলা গদ্যভাষারূপ নির্মাণের দক্ষতায় তাঁর স্বকীয়তা (Individuality) চোখে পড়ে।
- ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে — সেকালের উপযোগী করে যথাসম্ভব সহজবোধ্য বাংলায় সাধুরীতির লেখ্য গদ্যভাষা নির্মাণ ও ব্যবহার করেছেন। উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ আসে না, যেহেতু বাংলা চলিত রীতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রচলন তখনও বাংলা গদ্যসাহিত্যে হয়নি।
- রচনার সময়কাল (time) — উনিশ শতকের প্রথমদিক। সেসময়ের যুগচেতনা এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে।
- অধিবাচন (discourse) — এর ক্ষেত্রে বলতে হয় সহমরণ বিষয়ক সন্দর্ভ দুটি লিখিত মাধ্যমে প্রকাশিত এবং কথোপকথন রীতিতে যুক্তি দ্বারা বক্তব্যবিষয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- রচনার এলাকা (province) — এখানে অবশ্যই কলকাতা এবং উদ্দেশ্য কলকাতাসহ সারা বাংলা তথা এদেশের জনসমাজ।
- লেখক এবং পাঠকের সম্পর্ক (social status) — এখানে এক শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, যুক্তিবাদী, আধুনিক, মানবিক, কুসংস্কারমুক্ত সামাজিকের থেকে সমাজের তথাকথিত অন্য শিক্ষিত, মানবিক, আধুনিক মননের কাছে। লেখক-পাঠক তথা সামাজিক সম্পর্কের দিকটি খেয়াল রেখেই লেখনীতে বিশেষ বাচনিক শৈলীর গঠন লক্ষ করা যায়। কারণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, - “লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ।”^{২১}
- প্রকাশের ধরনে— অবলম্বিত হয়েছে বাংলা সাধু গদ্যভাষায় বিচার-বিশ্লেষণ-বিতর্কমূলক যুক্তিবাদী কথোপকথন রীতি।

- অন্যদিকে, সাহিত্য উপযোগী বাংলা লেখ্য গদ্যভাষা নির্মাণের অন্যতম প্রধান পথিক হিসাবে রামমোহনের বাকনির্মাণ ও ব্যবহৃত ভাষারীতির অভিনবত্ব ও স্বকীয়তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।
- রচনার বিষয় হিসাবে পেয়েছি উনিশ শতক এবং তার পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে সমাজে প্রচলিত ‘সতীপ্রথা’। নানা কুসংস্কারে জর্জরিত সমাজের কাছে সতীদাহ প্রথার নির্মমতা, প্রকৃত শাস্ত্র নির্দেশ, সামাজিক এক শ্রেণির সুবিধাবাদী ও নিষ্ঠুর মনোভাব সম্পর্কে সচেতনতা বিস্তার এবং ‘সতী’ মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্ধবিশ্বাস দূর করতে চিন্তাশীল, যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের প্রস্তাবনা আলোচ্য সন্দর্ভ দুটিতে পাই।
- লেখার প্রেরণা এখানে যুগচাহিদা তথা মানবিক চাহিদা। সমাজ-ইতিহাস ও সভ্যতার কাছে আধুনিক, সংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত মানুষ হিসাবে আমরা কতদূর সভ্য সেই প্রশ্নই বার বার তুলে ধরেছেন রামমোহন নিবর্তকের সংলাপের মাধ্যমে। যেমন—
- “নিবর্তক। অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরনকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না।...”^{২২}

অন্যদিকে, প্রাগগোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুসরণে আমরা শৈলীকে যদি সাধারণভাবে দুটি ভাগে ভাগ করে দেখি, যার মধ্যে একটি হল, “বাচনিক (Communicative) আর অন্যটি নান্দনিক (Aesthetic) (Garvin, 1964)।”^{২৩} আমাদের নির্বাচিত রামমোহন রায়ের লেখা ‘সহমরণ বিষয়ক’ প্রস্তাবে বিশেষভাবে এবং প্রাথমিকভাবে বাচনিক শৈলীর বৈশিষ্ট্যইগুলিই ধরা পড়ে। বাচনিক শৈলী অনুযায়ী এখানেও— (i) বিষয়কে, প্রকাশের উপযোগী রীতিতে যথাযথ ও অভিপ্রেত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, (ii) ভাষা যুক্তি নির্ভর, তাত্ত্বিক বিষয়ের উপযোগী এবং অদ্ব্যর্থক। আর এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সূত্রেই চলে আসে সংস্কারের প্রসঙ্গ। কারণ, সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর, তাত্ত্বিক বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ উপযোগী, অ-দ্ব্যর্থক ভাষা-ভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(৫)

প্রবন্ধ কী? — যার আছে প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। সে বন্ধন ভাবের, ভাষার, রূপের বন্ধন। আমরা ভাবগত ও ভাষা-শৈলীগত দিক থেকে রামমোহনের প্রাসঙ্গিক রচনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। এখন দেখা যাক সংস্করণগত ভাবে রূপের বন্ধনে ‘সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রবন্ধ হিসাবে কতদূর সার্থক। এ বিষয়ে শশীভূষণ দাশগুপ্তের বক্তব্যটি সামনে রাখা যায়—

“কোনো অংশ বা উপাদান যখন কোনো একটা প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভিতর দিয়া পরস্পর অস্থিত হইয়াছে এবং একটি সমগ্রতা লাভ করিয়াছে, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।”^{২৪}

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ বলতে ছন্দ, সর্গ, বিষয়, রচনার পারস্পর্যের বন্ধন ইত্যাদি বোঝাতো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে—

“এ সব কাজের আক্ষে জাগি এ প্রবন্ধ।

এতেকে তোম্মার তার হৈব নেহাবন্ধ।।”^{২৫}

— এখানে প্রবন্ধ অর্থে উপায় বা ব্যবস্থা। প্রবন্ধের সাধারণত যেসব লক্ষণগুলির কথা প্রাথমিকভাবে বলা হয়ে থাকে তা হল—

“প্রবন্ধ সাধারণত হবে ক্ষুদ্রায়তন গদ্য রচনা, তবে সবক্ষেত্রে আবশ্যিক নয়; প্রবন্ধের স্বাভাবিক মাধ্যম হবে গদ্য; প্রবন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার লক্ষ করা যায়; যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়; কল্পনা ও আবেগের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়, সেই সঙ্গে থাকে বিষয় ও উপস্থাপন রীতির বৈচিত্র্য।”^{২৬}

— এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবই রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক লেখায় চোখে পড়ে। কল্পনা ও আবেগের প্রয়োগ যদিও প্রায় নেই। কারণ হিসাবে উল্লেখ্য, প্রবন্ধকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (১) বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময় বা

আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ এবং (২) ব্যক্তিনিষ্ঠ, মন্বয় বা ভাবপ্রধান প্রবন্ধ।^{২৭} বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বুদ্ধিপ্রধান, এতে বিষয়ের প্রাধান্য এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়ীর তথা লেখকের হৃদয়বেগের প্রাধান্য থাকে।

বিশেষভাবে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই—

১. যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাবনার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থাকবে;
২. তত্ত্ব ও তথ্যের লক্ষণীয় প্রাধান্য থাকবে;
৩. প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভবের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠা ও মননের গুরুত্ব প্রাধান্য পাবে;
৪. প্রাবন্ধিক বৈজ্ঞানিক তথা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবেন;
৫. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধকারের থাকবে নিঃস্পৃহতা, নিরপেক্ষতা ও আনুষ্ঠানিক মেজাজ;
৬. ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা ও সংযম। ঋজু ও গম্ভীর ভাষার মাধ্যমে প্রবন্ধের বক্তব্য প্রকাশিত হবে;
৭. পাঠকের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে প্রবন্ধকার শিক্ষক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন।^{২৮}

—বলা বাহুল্য এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই রামমোহনের লেখা ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ —এ আমরা চিহ্নিত করতে পারি। ফলে, বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় রামমোহনের হাত ধরেই সংরূপ হিসাবে প্রথম প্রবন্ধ আমরা পেলাম এ কথা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। সেই সঙ্গে, বিশেষত তথ্যমূলক, যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল তথা বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ হিসাবে রামমোহনের উক্ত মৌলিক রচনা নিয়ে আর প্রশ্ন থাকে না।

(৬)

‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ — প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠ করতে গেলে আর একটা দিক অগ্রাহ্য করা যায় না— একদিকে যেমন ‘সতীপ্রথা’র উচ্ছেদ সংকল্পে তিনি আন্দোলনে নামছেন, সেই সঙ্গে সমাজে নারীর অধিকার বিষয়েও সরব হচ্ছেন। তিনিই প্রথম স্ত্রী জাতির প্রতি প্রকৃত অর্থে সহমর্মি হয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন— অসহায় স্ত্রীদের জোর করে দাহ করাতে এবং বার বার ওই দৃশ্য দেখতে সমাজের কি লজ্জা জন্মায় না? দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখি প্রবর্তক— নারীদের অল্পবুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা, অস্থিরমতি, চরিত্রস্থলনের কথা বলে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলে নিবর্তকের ভূমিকায় রামমোহন প্রশ্ন ছোঁড়েন —

“স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?... আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই। তবে, তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় কহেন?”^{২৯}

স্ত্রী নয় বরং সমাজে স্বামী তথা পুরুষের দ্বারা যে নারীর বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে সে বারবার; পুরুষের বহুবিবাহ, নারীর উপর বলপ্রয়োগ, চরিত্রস্থলন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এরূপ অজস্র উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে নারী জাতির অধিকার, মান-সম্মানের রক্ষার্থে লড়াই ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে, মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আনতে এবং অচিরেই তা কার্যকর করতে হবে সেপথেই আলো দেখিয়ে গেলেন রামমোহন। পরবর্তীতে বিদ্যাসাগরের হাত ধরে আমরা সেই প্রচেষ্টার অগ্রগতি ও রূপায়ণ হতে দেখি।

সাহিত্যের নান্দনিক শৈলীর ক্ষেত্রে বলা হয়, বিষয়ের গণ্ডি ভেঙে স্বাধীন হওয়ার মাধ্যমে সাহিত্য এক স্বতন্ত্র আকর্ষণের ক্ষেত্র গড়ে তোলে। সেই উনিশ শতকের সূচনাপর্বে বসে রামমোহন তৎকালীন সামাজিক তথা ধর্মীয় সংস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে কলমকে হাতিয়ার করেছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর এই পদক্ষেপে আমরা দেখলাম বাংলা প্রবন্ধের পথচলাও শুরু হয়েছিল, তা যেমন ঐতিহাসিক দলিল তেমনি কালজয়ী। এমন একটা সময় ছিল বাংলাদেশে তখন ষোড়শ শতক, আমরা দেখেছিলাম কিভাবে চৈতন্যের মতো এক মানুষ তাঁর চরিত্র-পাণ্ডিত্য-আদর্শ-ভাবনা-কর্ম-আচরণগুণে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি অঙ্গনে প্রেরণার উৎসমুখ হয়ে উঠেছিলেন। সেটা মধ্যযুগ। আর উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে আমরা দেখলাম যুগচাহিদা এবং মহৎ মানবিক চেতনা যখন কলমকে হাতিয়ার করে নেয়, তা কিভাবে সাহিত্যের নব পথ উন্মোচনের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে। যিনি মহাত্মা তিনি কখনোই হীনতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে স্বীকার করেন না। রামমোহনও পারেননি। প্রয়োজনে অগ্রপথিক হয়ে একাই পথে নেমেছেন। ‘সতীপ্রথা’র মতো কুপ্রথা দূরীকরণে তৎপর হয়েছেন,

আন্দোলন করেছেন, সমাজের চেতনা জাগাতে লেখনী ধারণ করেছেন। এতদূর আলোচনাক্রমে তাই একথা বলাই যায় আধুনিকতার প্রতিভূ রামমোহনের কলমেই সচেতনে বা অবচেতনে, কিংবা শুধুই মানবিকতার, যুগ চাহিদার তাগিদে সূচিত হয়েছিল সর্বজনবোধ্য বাংলা গদ্যভাষায় প্রথম যথার্থরূপে প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', 'চারিত্রপূজা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-১৬: আশ্বিন ১৩৮০, পৃ. ৬১
২. তদেব, পৃ. ৬৭ - ৬৮
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা- ১৭, সুভ সংস্করণ, ১৪০২, পৃ. ৫৩২
৪. বসু, স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯: প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৫
৫. চৌধুরী, প্রমথ, 'রামমোহন রায়', প্রবন্ধসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ২০২
৬. তদেব, পৃ. ২০৪
৭. তদেব, পৃ. ২০৯
৮. বসু, স্বপন, তদেব, পৃ. ০১
৯. বসু, স্বপন, 'সতী', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮২, পৃ. ১২৭
১০. সরকার, পবিত্র, 'ভাষাবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ', ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩: চৈত্র ১৪২৫, পৃ. ১৭
১১. তদেব, পৃ. ১৭
১২. ঘোষ, ডক্টর অজিত কুমার (সম্পাদিত), রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১২, পৃ. ১৬৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৭০
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৫
১৫. তদেব, পৃ. ১৬৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৭০
১৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, জুলাই ২০১৪, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনালয়, কলিকাতা-০৯, পৃ. ২৩১
১৮. সেন, সুকুমার, আশ্বিন ১৪২১, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৯
১৯. ঘোষ, ডক্টর অজিত কুমার (সম্পাদিত), তদেব, পৃ. ১৭৩
২০. নাথ, মৃগাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-০৬, পৃ. ১৮
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মাঘ ১৪১৭, 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা- ১৭, পৃ. ১৩
২২. ঘোষ, ডক্টর অজিতকুমার (সম্পাদিত), তদেব, পৃ. ১৭৪ - ১৭৫
২৩. মজুমদার, ড. অভিজিৎ, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৭ পৃ. ৩৩
২৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৩৪৯

২৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত), 'তাম্বুল খন্ড', বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ২০৮
২৬. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, তদেব, পৃ. ৩৫৯
২৭. তদেব, পৃ. ৩৫০
২৮. তদেব, পৃ. ৩৫১
২৯. ঘোষ, ডক্টর অজিত কুমার (সম্পাদিত), তদেব, 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', পৃ. ২০২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

ঘোষ ডক্টর অজিত কুমার (সম্পাদিত), রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১২

সহায়ক গ্রন্থ :

গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, কলিকাতা-০৯, গ্রন্থনিলয়, জুলাই ২০১৪

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা-০৯: রত্নাবলী, অক্টোবর ২০১২

চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, কলকাতা-১৭ : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, নভেম্বর ২০১৩

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী নগেন্দ্রনাথ প্রণীত, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত', কলকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী পঞ্চম খন্ড, কলকাতা-১৭: সুভা সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চারিত্রপূজা, কলিকাতা-১৬ : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৮০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', কলকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মাঘ ১৪১৭

নাথ, মৃগাল, ভাষা ও সমাজ, কলকাতা-০৬: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯

বসু, স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)', কলকাতা-০৯: পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ।

বসু, স্বপন, 'সতী', কলকাতা-০৯: পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮২

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত), বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, কলকাতা-৭৩: দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৪

মজুমদার, ড. অভিজিৎ, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা-৭৩: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭

রায়, অলোক, উনিশ শতক, কলকাতা-৭৩, প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১২

শ', ডঃ রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', কলকাতা-০৯: পুস্তক বিপণি।

সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, কলকাতা-৭৩: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চৈত্র ১৪২৫

সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা-০৯: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আশ্বিন ১৪২১

হালদার, গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা-৬: অরুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৪১৯

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), 'সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন রায়', কোরক সংকলন, কলকাতা-০৯: কোরক, ফেব্রুয়ারি ২০২২